অষ্টম অধ্যায়

বাংলা আধুনিক নাট্যধারায় ব্যক্তি মিথের রূপান্তর

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা আধুনিক নাট্যধারায় ব্যক্তি মিথের রূপান্তর

চাঁদসদাগর ও মনসা :

সাহিত্যে একই মিথ কি ভাবে বিভিন্ন কবির মনোবীণার তারে বিচিত্র সুরে অনুরণিত হয় তার কিছু পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে বাংলা কাব্যে মিথের রূপান্তর আলোচনা প্রসঙ্গে । কবিগণের ভিন্নতর রুচি, মর্জি, জীবনদর্শনের ওপর ভিত্তি করে একটি কাহিনী তারসপ্তকের ভিন্নতর সুরে মূর্ছনা তোলে । কবিরা শুধু সংস্কৃত পুরাণই নয়, লোকপুরাণের দ্বারাও প্রভাবিত হন । অবশ্য খোলা মনে উৎস সন্ধান নির্গত হলে দেখা যায় সমস্ত সংস্কৃত বা সংস্কারকৃত কবিতার শিকড়ে আছে লোকগান । মনসার গানকেও পরে সংস্কৃত পুরাণের অন্তর্গত করা হয়েছে, যদিও সেটি দীর্ঘ কাল দেশজ মনে আশ্রয় পেয়েছিল ।

বাংলা কাব্যে মঙ্গলকাব্য একটি বিরাট স্থান গ্রহণ করে আছে । মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য ছিল একাধারে বিনোদন ও লোকশিক্ষার বাহন । এগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাটি ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । একে তো ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র সর্পাঘাতের নিদারুণ ভয় ছিল । অন্যদিকে এর কাহিনীর থেকেও আকর্ষক চরিত্রগুলি । চাঁদসদাগরের চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা বাংলার ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে সহজে চোখে পড়ে না । আদর্শরক্ষার জন্য যিনি পার্থিব সম্পদ ক্ষয়, ছয়টি উপযুক্ত পুত্রের অকালমৃত্যু অকাতরে সহ্য করতে পেরেছেন, তাঁর মত মহান উজ্জ্বল চরিত্র সহজে চোখে পড়ে না । বেহুলার সতীত্ব, স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে তোলার জন্য আত্মত্যাগের তুলনা নেই । আর আছেন সনকা । চিরদু:খিনী বাংলাদেশের মায়ের প্রতীক । অন্যদিকে মনসাও মানবিক হয়ে উঠেছেন কবিদের সহানুভূতির স্পর্শে ।

মনসা পূজার উৎস সন্ধানে দেখা যায় শুধু বাংলা দেশে নয় বিহারে অনুরূপ একটি কাহিনী আছে । সেটি সংক্ষেপে এই, সোনাদহ হ্রদে স্নান করতে করতে শিবের পাঁচটি জটায় পাঁচটি পদ্ম ফোটে । তিনি ফুলগুলি বাড়িতে আনেন পূজার জন্য । গৌরী ফুল সাজাতে সাজিতে হাত দিতে সেখান থেকে ফুলের বদলে পাঁচটি কন্যা আবির্ভূত হয় । এঁর মধ্যে একজন কানা, নাম বলেন বিষহরি মনসা । তিনি বলেন, শিব তাঁদের পিতা । অত:পর ঝগড়া বাধে । ঝগড়া

করতে করতে মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে গৌরীকে দংশন করলে তিনি মারা যান । পরে মহাদেব ফিরে এলে আবার এই পাঁচকন্যাই গৌরীর দেহ থেকে বিষ তুলে নেন বা ঝেড়ে দেন । শিব তাঁকে বর দিতে চাইলে মনসা চাঁদসদাগরের হাত থেকে পুজা পাবার প্রার্থনা জানান । শিব বর দিলেও চাঁদসদাগর তাঁকে দেবী হিসাবে মানতে রাজী হন না । ফলে তাঁর ছয় পুত্রের মৃত্যু হয় । এরপর লক্ষ্মীন্দরের জন্ম হয় । বড় হয়ে একদিন সে মাছ ধরতে গেলে তার বড়শীতে একটি লোহার মাছ ওঠে । গঙ্গা দেবী আবির্ভূত হয়ে বলেন, যে মেয়ে এই মাছ কাটতে পারবে তার সঙ্গে তোমার পিতা যেন তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করে । বলা বাহুল্য একমাত্র বেহুলাই মাছ কাটতে পারে এবং সেটি রান্নাও করে । বাকি গল্পটাই বাংলা গল্পের অনুরূপ । একটু ব্যতিক্রম যে বেহুলা বাসরঘরে চারটি নেউল খাটের চার পায়ায় বেঁধে রেখেছিল । কিন্তু সে মায়াঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তার মাথার চুল বেয়ে কালসাপ উঠে লক্ষ্মীন্দরকে হত্যা করে ।

বাংলাদেশে অনেকসময় মনসার ঘটপূজায় পাঁচটি বা সাতটি ঘট পূজা হয় ।

উত্তর বিহারে প্রায় সর্বত্র মনসাপূজার প্রচলন ছিল । সেখানে গোটা শ্রাবণমাসের রাত্রে লক্ষ্মীন্দর বেহুলার গান গাওয়া হত । এখনও মানভূম, হাজারীবাগ ও গয়া জেলার কিছু কিছু নিম্নজাতির লোক মনসার গান গেয়ে বেড়ান । তাঁদের মতে চাঁদসদাগরের চম্পক নগরী বিহারের চম্পা নগর, বিহারিয়া নদীর নামে এসেছে বিহার নাম থেকে । আসামে মনসার গান জনপ্রিয় ছিল । অন্যতম বিখ্যাত কবি নারায়ণ দেবকে তাঁরা অসমীয়া বলে দাবী করেন ।

সাপের পূজা ভারতে কারা প্রচলন করেছিল জানা যায় নি । সাঁওতাল এবং অন্যান্য প্রোটোঅস্ট্রলয়েড জাতির মধ্যে সর্পপূজা নেই । সাপ এদের খাদ্য । ওদিকে ভারতীয়-মোঙ্গলীয় জাতি, আসামের বোড়ো, মিশমি জাতির মধ্যে এই পূজা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল এমন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি । দ্রাবিড় জাতির ইতিহাসেও সর্পপূজার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নি । মহেঞ্জোদারো ও রাজগীরে অনেকগুলি নাগকন্যা জাতীয় সর্পমূর্তি পাওয়া গেছে । মাদ্রাজে সরকারি মিউজিয়ামে যে নাগমূর্তিগুলি রক্ষিত আছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের নাগঘট ও পট ইত্যাদির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে । মহীশূরের মুদামা ও কানাড়ায় মঞ্চাম্মার সঙ্গে মনসা নামের মিল অনেক সমালোচক লক্ষ্য করেছেন । পূর্ব-পাঞ্জাবে অম্বালা ও

গুরগাঁও জেলায় যে দুটি সর্পমন্দির পাওয়া গেছে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা । কিন্তু পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের পরিচয় বা প্রমাণ সে যুগে ছিল বলে পাওয়া যায় না ।

তেলেগু ভাষায় সিজমনসা গাছের নাম চেংমুড় । তার তলে মনসা পূজা হয় । চাঁদ মনসাকে 'চেংমুড়ি কানী' বলে গালাগাল দিতেন । অথচ বাংলায় এই শব্দটি নেই । এর জন্যে কেউ কেউ বলতে চান কাহিনীটি দক্ষিণ ভারত থেকে আসছে । এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে এঁরা বলেন, দেবতার সামনে নৃত্যপ্রদর্শন করে তাঁদের কৃপা প্রার্থনার ধারণা দেবদাসীদের থেকে আসছে ।

কিন্তু বাংলাদেশে ফণিমনসা বলে যে ক্যাকটাস জাতীয় গাছটি আছে তার পাতা বা শাখাগুলি ফণাধরা সাপের মত । কাজেই মনসা শব্দটি বাংলাদেশের নিজস্ব মনে করা যেতেই পারে ।

মহাভারতে নাগ নামে যে জাতি ছিল, তার নেতা পুরুষ, নারী নন । তাদের সাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্তু নাগ রাজকুমারী উলুপীর সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হওয়ায় বোঝা যায় এখানে নাগ টোটেম । মহাভারতে বলা হয়েছে ঋষি জগৎকারু বংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করতে পূর্বপুরুষদের দ্বারা আদেশপ্রাপ্ত হলে বাসুকিভগ্নী জগৎকারুকে বিশেষ শর্তে বিবাহ করেন । পুত্র আস্তিকের জন্ম হলে সামান্য মাত্র ছুতো পেয়ে পত্নীপুত্রকে ত্যাগ করে সাধকজীবনে ফিরে যান । মনসামঙ্গল কাব্যে আছে পিতৃপরিত্যক্ত আস্তিক মাতৃস্নেহে বড় হয়ে মাতুলকুল সাপদের রক্ষার ভার নেন ।

মনসা নামটি পুরাণে স্থানলাভ করেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে । পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এর কোনটি দ্বাদশ শতাব্দীর আগে সঙ্কলিত হয় নি । আর মনসা পূজা একাদশ শতাব্দী থেকেই বেশ প্রতিষ্ঠিত । মনসামূর্তিও যতগুলি পাওয়া গেছে সবই দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত ।

তুর্কী আক্রমণের পর বাংলাদেশে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে যে আত্মিক মেলবন্ধনের

প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তার ফলে একদিকে শিক্ষিত বাঙালি যেমন রামায়ণ মহাভারত ভাগবত দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করতে লাগলেন তেমনই মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড অংশ সংযোজন করে সেগুলি আর্যীভূত হতে লাগল । মহাভারতের —

'জগৎকারুমুনেঃ পত্নী ভগিনী বাসুকৈমুথা
আস্তিকস্য মুনের্মাতা মনসা দেবী নমোঽস্তুতে'

শ্লোকটি পেয়ে মনসাকে পুরাণভুক্ত করা গেল । শিবের মন থেকে জাতা, তাই নাম মনসা । এই ভাবে তাঁকে পৌরাণিক করা গেল । যেমন 'চণ্ডী' নামটি থাকায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবীকে পার্বতী রূপে কল্পনা করা গেল । ধীরে ধীরে বহু উচ্চ কবিত্বসম্পন্ন কবির লেখনীর গুণে সাহিত্যমূল্য বৃদ্ধি পেল ।

চাঁদসদাগর বলে সত্যি কেউ ছিলেন কিনা এ কথা জানা যায় না । ইতিহাসে তাঁর নাম নেই । পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা চন্দ্রদেবকে অনেকে এই নায়করূপে চিহ্নিত করাতে চান । আবার কেউ কেউ এই বংশের পরবর্তীকালের রাজা হরিশচন্দ্রকে হরিশচন্দ্রধর বা চন্দ্রধর বলে বিশ্বাস করতে চান ।

যাঁরা মনে করেন মনসা পূজা ব্যাপারটাই ভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে তাঁদের কাছে চাঁদসদাগর অবাঙালি ব্যক্তিত্ব । এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না । মনে হয় তিনি রাজা ছিলেন না । কারণ কোথাও তাঁকে রাজা বলা হয় নি । বণিক বা সওদাগরই বলা হয়েছে । তবে বণিকরা বরাবরই পরোক্ষভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেন । তাঁরাই কিং মেকার এই রকম একজন বণিক সম্প্রদায়ের নেতা, ঐশ্বর্যে রাজার থেকে কম নয় এমন মানুষের অস্তিত্ব বা কল্পনা কোনটাই অসম্ভব নয় । এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি সুন্দর মন্তব্য আছে, 'অভিষেকোৎসুক রাজপুত্রের দীর্ঘ বনবাসের নিদারুণ আদেশ যেমন ভারতবর্ষের এক করুণ মহাকাব্যের মূল সত্য, তেমনই বিবাহিত জীবনের আনন্দোৎসুক দৈবাৎ সর্পদংশনে মৃত্যুর মত কোন মর্মান্তিক সত্যঘটনাও হয়ত এই মনসামঙ্গলগুলির মূল সত্য । সেদিন অপরিস্ফুট যৌবনা বেহুলার বাসর রাত্রেই বৈধব্যের কথা শুনিয়া বাল-বিধবাপীড়িত এই হিন্দু সমাজও হয়ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল । তরুণ তরুণীর প্রস্ফুটনোম্মুখ জীবনের মূলে ক্রূর নিয়তির এই নিদারুণ পরিহাস যে

কোন উচ্চতর কাব্যের রস-প্রেরণা দান করিতে সক্ষম । তারপর এতদ্দেশীয় সাহিত্যিক প্রথা অনুযায়ী কাহিনীটিতে একটি মিলনাত্মক রূপ দিবার ইচ্ছা ইহার অবশিষ্টাংশ কবি কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে ।'[১]

এমন আকর্ষক কাহিনী ও চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নানা রূপে বার বার ফিরে এসেছে । ছোটগল্প লেখা হয়েছে মহাশ্বেতাদেবীর 'বেহুলা' (যেখানে গ্রামের নাম ও নদীর নাম দুইয়ের নামই বেহুলা, লোকপ্রবাদ অনুসারে যে জল সাপে কাটা দেহ ভাসালে মানুষ জীবন ফিরে পায়), শওকত আলীর গল্প 'শুন লক্ষ্মীন্দর হে' (এ গল্পে গুপীনাথ বলে, 'ছোটজাতের মানুষ হইল বিষহরি মায়ের সন্তান'), অভিজিৎ সেন লিখেছেন 'বিদ্যাধরী ও বিবাদী লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী', সোনিয়া হোমেনের উপন্যাস চাঁদবেনে, অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের রামচন্দ্র চাঁদবেনের রূপান্তর । চিত্রকলাতেও প্রভাব পড়েছে এই কাহিনীর । নীরদ মজুমদার এঁকেছেন চাঁদ ও বেহুলা সিরিজের ছবি । কবিতার কথা উল্লেখ হয়েছে আগে । এই প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার শিকদারের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যায়, "খাঁটি মিথের মধ্যে অন্তর্লীন থাকে যে 'আইডিয়াল ইটারনাল হিস্ট্রি' সেই নির্বস্তুক শাশ্বত ইতিহাস, অপ্রতিরোধ্য ও দু:সমাধেয় বিরোধের কালাতীত উপাখ্যান চাঁদসদাগরের কাহিনীর মধ্যে বদ্ধমূল ।"[২]

মন্মথ রায় চাঁদসদাগরকে নিয়ে নাটক লিখেছেন । তিনি রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের নাট্যকার । এই সময়ের নাট্যকারদের রচনায় যে বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে, তা হল নাটকের বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে দেশ বা সমাজ নয়, ব্যক্তিমানুষ ।

এ যুগের সাহিত্যিক হয়েও মন্মথ রায় তাঁর সব নাটকের কাহিনী নিয়েছেন পুরাণ থেকে । কিন্তু এগুলি পৌরাণিক নাটক নয় । কারণ পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট রস, ভক্তি রস এখানে নেই । দেবতাদেরও মাটির মানুষের মতো অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে । এরা যেন অতীতের পোষাক পরিহিত বর্তমান যুগের মানুষ । পুরাণের আড়ালে সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসে পড়ায় 'কারাগার' নাটকটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল ।

চাঁদসদাগর নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে, আর্ট

থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত মনোমোহন থিয়েটারে । প্রযোজনায় ছিলেন প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অহীন্দ্র চৌধুরী ।

এই নাটকটির প্রধান চরিত্র চাঁদ, মনসা ও বেহুলা । কিন্তু সনকারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে । তাঁর মাতৃরূপ বড় । সন্তানের প্রতি স্নেহে তিনি স্বামীর নির্দেশ অমান্য করেন । স্বামীর ক্রোধের কাছে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত কারণ সন্তানের মঙ্গল অনেক মূল্যবান । চাঁদসদাগরকে কিন্তু নাট্যকার মহামানব বানান নি । সহজেই তিনি মনসার মোহিনী মায়ায় ভুলে 'মহাজ্ঞান' হারান । কর্ণ তাঁর রক্ষাকবচ জেনে শুনে ছদ্মবেশী ইন্দ্রের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন 'দানবীর' বিশেষণ সত্য রাখার জন্য । কিন্তু চাঁদ অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো মোহে মুগ্ধ । 'সপ্তডিঙা মধুকর' হারিয়ে তিনি ঘরে ফেরেন 'চোরের মত' । বেহুলাকে নিয়ে আশায় বুক বাঁধতে চান আবার প্রচন্ড ক্রোধে মনসাপূজকদের আঘাত করার জন্য সেনা আহ্বান করেন । তিনিই আবার বেহুলা একলা ফিরেছে শুনে লক্ষ্মীন্দরকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি মনে করে তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকেন । কারণ বেহুলার নিষ্ঠা ও কষ্ট তিনি অনুভব করতে পারেন ।

মন্মথ রায় তাঁর চাঁদসদাগর নাটকে মোটমুটি সম্পূর্ণ মনসামঙ্গলের কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন । তিনি ধন্বন্তরী নামে যে চরিত্রটি রচনা করেন অনেক কবির কাছে তার পরিচয় শঙ্কর গারড়ী । তবে ধন্বন্তরী নামও পাওয়া যায় ।

নাট্যকারের সহানুভূতি চাঁদের প্রতি । কিন্তু মনসাকেও তিনি খুবই মমতায় চিত্রিত করেছেন । মনসার বিবর্তন সুন্দর ফুটেছে যখন তিনি আস্তিককে তাঁর দু:খের কথা বলছেন, — "মাতৃগর্ভে আমার স্থান হয় নি ...... দেহে মায়ামমতার নাড়ী নেই । বিমাতা বিনা দোষে আমার চোখে আঘাত করেছেন ...... তাঁরি কাছে সেইদিন বিনা দোষেও আঘাত করে — কেমন করে রুদ্র আনন্দ লাভ করা যায় শিক্ষা পেয়েছি । বিনা দোষে স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছেন — অকারণ কঠোর আর কঠিন কি করে হতে হয় আমি তাঁর কাছেই ভালে করে, মর্মে মর্মে শিখেছি — দেবতার কন্যা হয়ে স্বর্গের হতে পার্লুম না — মর্ত্যের পূজা পেলুম না ।"[৩] দেবতাদের এই রকম মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চারিত্রিক বিবর্তন হতে দেখা যায় না ।

নাট্যকার আরো দেখাচ্ছেন, চাঁদের পূজা না পেলে তিনি মর্ত্যে প্রতিষ্ঠা পাবেন না, শুধুমাত্র এই কারণেই তিনি চাঁদের পূজা চান নি । চাঁদের নিষ্ঠা তাঁকে মুগ্ধ করেছে বলে তিনি চাঁদের পূজা চেয়েছেন । সমুদ্রে প্রায়-ডুবন্ত চাঁদকে দেখে আবেগে মথিত হয়েছেন, "আজো তোর জয় । তোমার নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি । আর তা হয়েছি বলেই তোমার হাতে পূজা পাবার লোভে আমি আজ মাতাল হয়ে চললুম ।' এই অংশটি মঞ্চসফল হতে বাধ্য ।

আবার বেহুলার কণ্ঠেও তিনি আন্দোলিত । "মাঝ থেকে এক কুসুম-পেলব বালিকার বুকে শেলাঘাত কর্লুম ।" ...... "আর ও দৃশ্য দেখতে পারছি না বোন ।" তীব্র অনুতাপে মনসা ভেঙে পড়েছেন মানুষীর মতো , শেষে যখন বেহুলার নাচে তুষ্ট হয়েও দেবতারা পুরস্কার স্বরূপ তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে ইত:স্তত করছেন তখন মনসাই এগিয়ে আসেন । "হাঁ পুরস্কার । আর কেউ না দেয়, আমি দেব ।" শিব মনে করিয়ে দেন চাঁদ এখনও পূজো দেয় নি । তখন তিনি বলেন, "জানি, আমি জানি । কিন্তু — কিন্তু ..... এই তপসীর ...... এই সতীকুলরানীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে যদি সে পূজা পাবার আশা চিরকালের মতো অন্তর্হিত হয় — হোক ।"

এখানে মনসা আপন মহিমায় দেবীত্বে উন্নীত হয়েছেন । বেহুলা চরিত্র কল্পনায় পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা 'স্বপ্নের মতো' তাঁর মনে পড়ে । সেই জন্মে লক্ষ্মীন্দর ছিলেন অযোধ্যার নট, আর তিনি ছিলেন গন্ধর্ব-কুমারী । নটের অভিনয় দেখে পাগল হয়ে রোজ স্বর্গপুরী ত্যাগ করে আসরে এসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন । একদিন তার পিতা সন্ধান পেয়ে অদৃশ্য থেকে সেই নটের বুকে তীর মারলেন । তাঁর বুকের রক্তের ফোয়ারার ওপর বেহুলা আছড়ে পড়লেন । সেই রক্ত তাঁর সিঁথিতে রক্ততিলক এঁকে দিল । "ঐ সিঁন্দুর আজো ওঠে না । ধুলে ওঠে না, মুছলে যায় না, ঘষলে যায় না ।" লক্ষ্মীন্দর বলেছে, "ভালোবাসা সত্য হলে ঐ সিন্দুর রেখাও সত্য হবে ...... উঠবে না ..... যাবে না ।" বেহুলার মা অমলাও বলেন, "ঐ সিন্দুর — যদি নিয়তিরই লেখা হয়, ও উঠবে না — উঠবে না ।" নাট্যপরিণতির স্পষ্ট আভাস এখানে পাওয়া যায় ।

এ নাটকে চাঁদসদাগর স্নেহের অনুরোধেও মনসাকে পূজা দিতে পারেন নি এমনই প্রখর ছিল তাঁর নীতিজ্ঞান । মূল কাব্যের সঙ্গে পার্থক্য ঘটিয়ে এখানে নাট্যকার শিবকে ছদ্মবেশে

আনয়ন করেছেন । তিনি বলেছেন সর্পভূষণ ছাড়া শিবমূর্তি অসম্পূর্ণ । তিনি নীলকণ্ঠ । এতে চাঁদসদাগরের প্রকৃত জ্ঞান হল এবং 'অন্যমনস্ক তাঁর হাতে' বেহুলা ফুল গুঁজে দিয়ে পূজা দেওয়ালেন ।

বর্তমান নাট্যজগতে যাঁরা পরিবেশনা উপস্থাপনা অভিনয় সবদিক থেকে নতুন মাত্রা সংযোগ করেছেন তাঁদের মধ্যে শম্ভুমিত্র এক স্মরণীয় নাম । তিনি মৌলিক নাটক একটি মাত্র রচনা করেছেন, 'চাঁদ বণিকের পালা ।' পূর্ণাঙ্গ এই নাটকে আজকের সমাজের 'অদ্ভুত আঁধার' আঁকতে ও তার থেকে উত্তোরিত হবার পথ খোঁজার জন্য তিনি প্রাচীন মঙ্গলকাব্য আশ্রয় করেছেন । বাংলাদেশের মধ্যযুগের একটি বড়ো অংশ (চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতক) অধিকার করে আছে মঙ্গলকাব্য, এই সময়টার রাজনৈতিক পটভূমিকার দিকে দেখলে বোঝা যায় পঞ্চদশ শতকে হুসেনশাহী রাজত্বের সময়ে ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে ষোড়শ শতকে সর্বাত্মক ভাবে নব জাগরণ ঘটেছে । কিন্তু এই একশো থেকে দেড়শো বছর বাদ দিলে বাকি শত শত বছর ছিল ছোটো ছোটো রাজা ও নবাবদের শাসন, শোষণ, অবিচার । দিল্লির প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করতেন তাঁদের রাজধানীর জন্য কর সংগ্রহ করতে হত যে কোনো উপায়ে । বাকি অর্থ নিজেদের বিলাস উল্লাসে খরচ হত । প্রজাদের জন্য কেউই মাথা ঘামাত না । এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিতে মুকুন্দরাম দত্ত আত্মপরিচয় । "যে সময়ে কবিকঙ্কন চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখেছেন সে সময়ে মানুষের আকস্মিক উথ্থান পতন বিস্ময়রূপে প্রকাশিত হত । তখন চারিদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে এবং কার ভাগ্যে কি হয় কেউ বলতে পারছে না । যে ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিক মত স্তব করতে জানে, যে ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধি লাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ ।"[৪]

এই জন্য তখনকার দিনের মানুষ যে কোনও দেবতার কাছে মাথা নত করেছেন । শিব আছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ শক্তিহীন । বিষ্ণু এসেছেন সত্যনারায়ণ রূপে কিন্তু তাঁর প্রকৃত সত্তা গবেষণা করে বার করতে হয়েছে । বাকিরা গ্রামীণ দেবতা । আসলে পৌরাণিক দেবতারা যেন দূরের, ধরা ছোঁয়ার বাইরে । সংস্কৃত ভাষার মোড়কে ঢাকা । আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু সাধারণ মানুষ চায় ঘরোয়া সুখ, একটু নিশ্চিন্ত জীবন । 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' — এইটুকু কামনা তার । গ্রামীণ দেবতারা তাদের কাছে আপনতর, তাদের

সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলা যায় । দেবতাদেরও যেন লোকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশে যেতে চান । দেবীকে তুষ্ট করলেই তিনি ভক্তকে রক্ষা করবেন । কালকেতুর মত অযোগ্য লোক শুধুমাত্র দেবীকৃপাতে রাজা হয় । তার রাজ্যে প্রজা বসানোর জন্য চন্ডী অকারণে পাশের গুজরাট দেশকে জলে ভাসিয়ে দেন । চাঁদসদাগর মনসার কোপে সর্বস্বান্ত হন । লাউ সেন ধর্মঠাকুরের দয়ায় অনায়াসে লৌহগন্ডার টুকরো করেন পশ্চিমে সূর্যোদয়ও দেখান । "একদিন অলৌকিকতার প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্পষ্ট ছিল সেই সূত্রেই কবি দেবতার নামে তাহাই প্রচার করিয়েছেন, তাহাই সমাজ শ্রদ্ধায় হোক ভয়ে হোক গ্রহণ করিয়াছে । মঙ্গলকাব্যগুলি সেই যুগের সৃষ্টি ।"[৫]

আজও কিন্তু এই সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রায় কিছুই পরিবর্তন হয় নি । এখনও বিচারের নামে প্রহসন চলে । যার শক্তি আছে এবং যার অর্থ আছে, তার সবই আছে । বাকিদের যোগ্যতা থাকতেও কিছু হয় না । যে ছেলে আগাগোড়া বিদ্যালয়ে ভালো ফল দেখিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পরীক্ষার খাতা হারিয়ে যেতেই পারে, অথবা অন্যরা টাকা দিয়ে আগে থেকে প্রশ্নপত্র কিনে রাখতে পারে । পরীক্ষায় ভালো করলেও চাকরি ক্ষেত্রে কি হবে সে জানে না । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উৎকোচ ভিন্ন স্থায়ী চাকরি অথবা পদোন্নতি হয় না । আজ যে ভালো পদে চাকরি করছে, কাল রাজনীতির ছক বদলালে সে কোথায় থাকবে সে জানে না । রাজনীতির কাঠামো ক্লিন্নতার চরমে । বরং এখানকার মানুষের ধারণা সৎ পথে থেকে কারো ভালো হয় না । তাই অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস বাড়ছে । নতুন দেবী এসেছেন, 'সন্তোষী মা' । মোড়ে মোড়ে শনি পূজা বেড়েই চলছে । জ্যোতিষী দেখান, আঙুলে আংটির সংখ্যাও বাড়ছে । কিন্তু প্রকৃত ভক্তর মত দেবতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতাও চলে গেছে । তাই অসুখ করলে ডাক্তার ডাকা হয়, জল পড়া, মাদুলীও চলে । পরীক্ষার আগে টিউটর ও দইয়ের ফোঁটা, ঠাকুরবাড়িতে পূজা পাঠানো তাও চলে । মানুষ বাঁচার তাগিদে নীতিবোধ বিজর্সন দিচ্ছে, কিন্তু বাঁচাতেও পারছে না । রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ যুগের পক্ষেও প্রযোজ্য ।

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালায়'[৬] এমনই এক ভাগ্যহত মানুষকে দেখান হয়েছে । মনসামঙ্গল কাব্য আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় রেখে তিনি নাটক রচনা করেছেন । তাঁর চাঁদ বণিক প্রথা, ভীতিপ্রদর্শন সমস্ত জয় করে তরী ভাষায় । সে তার দেশকে বাঁচাতে চেয়েছে । এ

দেশের মধ্যে বাইরে থেকে নতুন শক্তি এনে তাকে সঞ্জীবিত করতে হবে। "ভাই রে, আমি জানি এ দেশের অন্তর মরে নাই। সে আমাদের ডাকে।"

কিন্তু অধিকাংশ সৎ কাজের মত তার অভিযান বিফল হয়। তার "পথ সত্য চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য" বলে যে আত্মবিশ্বাস ছিল, ধ্বংস, হয়ে যায়। বাস্তব জীবনে সে ব্যর্থ মানুষ। ঘরে ফিরতে হয় লুকিয়ে। এসে দেখে স্ত্রী পুত্র তার ওপর বিরূপ। দেশের অবস্থা আগের থেকেও ভয়াবহ। শ্রদ্ধেয় গুরু পর্যন্ত নীতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। চাঁদকে বলা হল টিকে থাকতে হলে তাকে কোন-না-কোন দলে যোগ দিতেই হবে। ঠিক যেন বর্তমান ভারতবর্ষ।

পরে অবশ্য লক্ষ্মীন্দর তার বাবাকে বুঝল এবং ঠিক হল সে এবার অভিযানে বার হবে। যাত্রার আগে বিবাহ, বিবাহের রাত্রে সন্তানের করুণ অপমৃত্যু এবং বেহুলার একক অনিশ্চিত পথে যাত্রা। চাঁদ বণিক এবারে তার নীতি বিসর্জন দিল। লোভের জন্য নয়, স্নেহের জন্য। কিন্তু স্নেহাস্পদদের ফিরে পেল না। "পূজা দেওয়া হোল, তবু যেন পূজা দেওয়া হয় নাই। পাড়ি দিয়েছিনু, তবু যেন পাড়ি দেওয়া হয় নাই। ঘর বেঁধেছিনু, তবু যেন ঘর বাঁধা হয় নাই।" সব কিছু হারাবার ট্র্যাজিক আর্তি ফোটে।

বর্তমান যুগে শীর্ষে ওঠার পথ, কৃতী হবার অধিকাংশই জটিল এবং ক্লেদাক্ত। বেহুলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। লক্ষ্মীন্দর এই নির্মম সত্য সহ্য করতে পারে না আর বেহুলা তাকে ভালোবাসে বলে একত্রে বিষ পান করে।

সনকাও উন্মাদ। যেমন বাস্তবের রূঢ় কশাঘাতে আশাভঙ্গের বেদনায় এ যুগের উন্মাদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু চাঁদ বণিকের বৈশিষ্ট্য এই যে আঘাতেও সে আত্মহননের পথ নেয় না বা পাগল হয় না। সে আজ যাবে 'শিবের সন্ধানে।' শিব অর্থ মঙ্গল। আজকের মানুষ নির্মোহ সত্যের মধ্যে মঙ্গল অনুসন্ধান করবে যতই আঘাত আসুক। কিন্তু সে একা যাবে না। তার সঙ্গী হবে সারা দেশ।" এ আঁধারে চম্পক নগরী পাড়ি দিবে।" এই স্বপ্নই তাকে ও সারা দেশকে বাঁচিয়ে রাখে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সওদাগরের নৌকা'[৭] নাটকে চাঁদ সদাগরের কাহিনীটি অনেকটা প্রতীকের মতো ব্যবহার করেছেন । গ্রামের মানুষ প্রসন্ন যাত্রা দলে চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করত । অনেক সময় সে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে যেন অভিন্ন হয়ে যেত । নাটকের প্রথমে সে তার স্ত্রীকে বলছে নিচু হয়ে ঘরে ঢুকতে তার কষ্ট হয় । "মাথা নিচু করলে বড়ো লাগে । চাঁদ সদাগর কি না মাথা নিচু করে নি ।" সে মাঝখানে পাগল হয়ে গিয়েছিল । দলের নতুন ছেলেদের ষড়যন্ত্র না সত্যিই উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়েছিল পরিস্কার করে তার ওপর আলোকপাত করা হয় নি । যে সময় তাকে দেখানো হচ্ছে তখন একদিকে আছে অতীতের স্বপ্ন আর ভবিষ্যত জীবনের অনিশ্চয়তার ভয় । অথচ বর্তমানে স্ত্রীর প্রতি প্রেম, পুত্র ও পুত্রবধূর ওপর মায়ার অন্ত নেই ।

এমন সময় হঠাৎ সে আবার পালা করার আমন্ত্রণ পায় কয়েকটি রাত চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য । সে যেন নিজেকে ফিরে পায় । কিন্তু এ আনন্দ সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারে না ঘরে ফিরে প্রিয় বন্ধু মৃত জেনে । এরপর তার দীর্ঘদিনের জন্য বেশ পাকাপাকি ভাবে অভিনয় করার ডাক আসে । কিন্তু এবার চাঁদের ভূমিকায় নয়, গোদা মালোর ভূমিকায় । নায়ক থেকে বিদুষক । কিছুটা ইতস্তত করে সে এই আহ্বান গ্রহণ করে । কারণ চাঁদের নৌবহর যেন বহতা জীবনের প্রতীক । "সওদাগর নৌকা ভাসাও" — এই সুরে তার মনে হয় 'সাপের বাঁশী বেজে উঠলো, দুলতে লাগল শঙ্খচূড়ের নাচের তালে হিংস্র ঘর ছাড়ানো মানুষ ।' সে বলে, "বড়ো বৌ, শুনতে পাচ্ছে ময়ূরপঙ্খী দুলছে ? নাগিনীর মতো ঢেউ উঠছে ফুলে ফুলে, পালে দক্ষিণের হাওয়া লেগে ঢেউ উঠছে ফুলে ফুলে, পালে দক্ষিণের হাওয়া লেগে সামুদ্রিক জলচরের পেটের মতো উত্তাল হয়ে উঠেছে । আমার চারিদিক থেকে মহতী ধ্বনির বেগবান গান উঠছে প্রকম্পিত হয়ে সেই আদিমতম পরমতম ঘর ছাড়ার ডাক , সওদাগর নৌকা ভাসাও — এখানে হারলেও জিত, জিতলেও হার ।"

নাটকটিতে লোকায়ত দেবী মনসা সম্বন্ধেও সুন্দর একটি বিশ্লেষণ আছে ।

আশা মনসা সম্বন্ধে বলে, "কেমন জেদী, কেমন ঠাকুর দেবতার মতো না, কেমন যেন মানুষের মতো । প্রসন্ন । "মানুষই যে ভেবেছে দেবতাকে । আর সব দেবতারা সাবেকি,

মনসা যে নতুন ঠাকুর। অন্য দেবতাদের কল্পনা করেছে ব্রাহ্মণ ঋষিরা। মনসাকে কল্পনা করেছ লোকেরা — এই যে দেবতাকে ছল করতে হয়, বল করতে হয়, কৌশল না করলে চলে না — এই যে তার মানুষের মতো ব্যবহার দেবতার এই কল্পনাই তো যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের নতুন স্বর্গ কল্পনা। এ যেন প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে অল্প শক্তির মানুষের লড়াই। ফলাফল অনিশ্চিত। তবু চাঁদ তখন দেহের শক্তিতে হারেন তখন মনসাও আত্মার শক্তিতে হেরে তার সমান হন। তখন যে হেরেও জেতে, তারই জিত।" এই নাটকটিতে মিথিকাল অনুষঙ্গ এসেছ ঘুরে ঘুরে। প্রবীণ স্বামী-স্ত্রী জীবনে তখন হারতে বসে স্ত্রী বলে, "আমরা যে বড় আশা করেছিলাম।"

প্রসন্ন। "ঠিক। আমরা আশা করেছিলাম। সোনার হরিণের মতো আশা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে। সময়কে দরজায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম সহোদর লক্ষ্মণের মতো। সে-ও গণ্ডী ছেড়ে গেল। আর দারিদ্র এল উজ্জ্বল মহান সন্ন্যাসীর বেশে, তোমাকে নিয়ে গেল চুরি করে। হায় রে, কেন বার বার করে পৌরাণিক ভুল করে যে মানুষ।"

এই পৌরাণিক সচেতনতার জন্য নাট্যকার নাটকের শেষে বলেন, "দিগবিদিক থেকে 'নৌকা ভাসাও' এই ঐক্যতান যেন তাদের ডুবিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। অদৃশ্য সূত্রের আলোতে প্রসন্নকে চাঁদ ও কালোর মাকে সনকার মত পৌরাণিক মনে হয়। তাঁদের দুজনের ওপরের আলোর ঢেউ কাঁপছে। এবং বর্তমান কাল যেন আলোতে ঐক্যতানে অনন্ত সময়ের গুহায় বারংবার উচ্ছ্বসিত আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিরন্তর।"

দ্রৌপদী :

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে দ্রৌপদীর মতো চরিত্র বিশেষ নাই। অনেকের মতে মহাভারতের মহাযুদ্ধের মূলেই তিনি। তাঁকে না পেয়ে বীর কর্ণের ক্ষোভ, তাঁর বিদ্রূপভরা হাসিতে দুর্যোধনের ক্রোধ, তাঁকে ঘিরে পঞ্চপাণ্ডবের জীবন এই দুই মিশ্র উপাদানের দ্বন্দ্বে জাত মহাযুদ্ধ। রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, ব্যক্তিত্বে, স্বামীদের সঙ্গে অকাতরে যন্ত্রণাময় জীবন যাপনে কোথাও তিনি পিছিয়ে পড়েন নি। রন্ধনেও তিনি মিথ বিশেষ। চারুসৌন্দর্য সৃষ্টিতে সৈরিন্ধ্রি। তাঁর দীপ্তি ও দ্যুতির তুলনা নেই।

দ্রৌপদী যজ্ঞবেদী থেকে উথ্থিতা । মনে হয়, কবি বলতে চেয়েছেন কোন মানব মানবী তাঁর মত কন্যার জন্ম দিতে সমর্থ নয় । পবিত্র হোমাগ্নি থেকে এই অপরূপা, সর্বাঙ্গ সুগঠিতা পূর্ণ যুবতী সুকেশী কৃষ্ণা উঠে এলেন তখন নিশ্চয় সমুদ্র মন্থনজাত লক্ষ্মী ও উর্বশীর উথ্থানের মত সমবেত জনতা মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন ।

ঘটনাটি চিন্তা জাগায় । দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাজা দ্রুপদ ব্রহ্মর্ষি যাজককে সম্মত করিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার মানস করেন । দীর্ঘকাল যাজ ও উপযাজকে তুষ্ট করে দশকোটি গোধন দান করে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হল, দেখা গেল তার চরম মুহূর্তে মহারানী প্রস্তুত নন । যজ্ঞ শেষ করে যাজ দ্রুপদ রাজমহিষীকে ডেকে বললেন, " 'রাজ্ঞী আসুন আপনার দুই সন্তান উপস্থিত হয়েছে ।' তখন মহিষী বলেন, 'আমার মুখ প্রক্ষালন ও স্নান হয় নি । আপনি অপেক্ষা করুন । যাজ বললেন, 'যজ্ঞাগ্নিতে আমি আহুতি দিচ্ছি । উপযাজ মন্ত্রপাঠ করছেন । এখন তা থেকে অভীষ্ট ফল লাভ হবেই । আপনি আসুন বা না আসুন ।"[৮] এটি কি কাকতালীয় ঘটনা ? না তাঁর পক্ষে দ্রৌপদীর মত কন্যা গর্ভে ধারণ করা সম্ভব ছিল না বলে সন্দেহ থেকে যায় । কারণ, এত আয়োজনের পরে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না কেন ?

দ্রৌপদীর জীবনকথাও বিচিত্র । তাঁর পঞ্চপতি লাভের কথা সর্বজনবিদিত । পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না । যেটা অবাক করে সেটা হল এই ঘটনায় সেদিনকার মানুষ প্রায় কিছুই বিচলিত হয় নি, বরং আজ আমরাই হই । ব্যাস একটি কাহিনী বলে দিলেন পূর্বজন্মে দ্রৌপদী শিবের কাছে পতিলাভের জন্য বর প্রার্থনা করার সময় পাঁচবার শব্দটি উচ্চারণ করার জন্য এ জন্মে পঞ্চপতি লাভ করেছেন । অবশ্য তিনি বলেন, "মানুষের পক্ষে এরূপ বিবাহ বিহিত নয়, কিন্তু এঁরা দেবতার অবতার । মহাদেবের ইচ্ছায় দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হবেন ।"[৯] তিনি দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে দিব্য চক্ষুর সাহায্যে তাঁর পূর্বজন্মের পঞ্চপতি পঞ্চইন্দ্রকে দেখালেন, যাঁরা এ জন্মে পঞ্চপাণ্ডব রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন । দ্রুপদের শত্রুপক্ষও কিন্তু এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নি । ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত বয়:জ্যেষ্ঠও বিনা দ্বিধায় এ বিবাহ স্বীকার করেছেন । পাশা খেলার আসরে দুর্যোধন দু:শাসন, কর্ণ এই নিয়ে নানা অপমানসূচক কথা বলেছেন । তবু মনে হয় এ ঘটনা না ঘটলে, অন্য কিছু কথা নিয়েও তাঁরা বিদ্রূপ করতেন । কারণ অপমান করাটাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ।

আসলে সেকাল ও একালের সমাজব্যবস্থার মধ্যে বহু পার্থক্য ঘটে গেছে । এবং এই পরিবর্তন স্বাভাবিক । আজ একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর মায়ের সময় কত বদলেছে, আবার তিনি তাঁর মায়ের যুগ থেকে মূল্যবোধের দিক থেকে বদলে ছিলেন । সাজপোষাক, জীবনযাত্রা প্রণালী, আচারব্যবহার রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ সবই পরিবর্তনশীল । আজকের কোন শ্বশ্রুমাতা সত্যবতীর মত ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য কোনো পুত্রবধূর ওপর জোর খাটাতে গেলে বে-আইনি কাজ করা হবে । কোনো স্বামীও পাণ্ডুর মত অন্যের ঔরসজাত পুত্র গর্ভে ধারণ করতে পত্নীকে নির্দেশ দিতে পারেন না । আবার আজকের ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিবাহ করে বা পতি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ ঘটালে সমাজে প্রাত:স্মরণীয়া হতে পারেন না । সেকালে হতেন ।

"অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী মন্দোদরীস্তথা
পঞ্চকন্যা: স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনং ।"

তখনকার সমাজে ধর্মশাস্ত্রের দায়ভাগ বা উত্তরাধিকার অংশে বারো ধরনের পুত্রের কথা আছে । এরা সকলে বৈধ সন্তান বলে বিবেচিত । তবে পিতৃসম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গুঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ । বাকি ছয় রকমের পুত্র কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌর্নভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌত্র পিতৃধনে বা সিংহাসনের অধিকারী হতেন না কিন্তু তাদের পিতৃপরিচয় থেকে বঞ্চিত করা হত না ।[১০]

অজ্ঞাতবাস কালে দ্রৌপদী বিরাট রাজার মহিষী সুদেষ্ণাকে বলেন, তাঁর পাঁচজন গন্ধর্ব স্বামী আছেন । তারা তাঁকে সবসময় রক্ষা করেন । গন্ধর্বদের মধ্যে সামাজিক নীতির একটু শিথিলতা ছিল । গন্ধর্ব বিবাহ শব্দটিও তার একটি প্রমাণ । কিন্তু তাঁরা দেবতা নন, মনুষ্য সমাজেরই । যেমন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অর্জুনের সখা ছিলেন । গানের জন্য কিন্নর ও নৃত্যের জন্য গন্ধর্বরা প্রসিদ্ধ ছিলেন । এখনও হিমালয়ের কোনো কোনো অংশের লোকেদের কিন্নর ও গন্ধর্ব মনে করা হয় । এক গবেষক দেখিয়েছেন পার্বত্য অঞ্চলে অনেক কন্যার এক স্বামী অথবা অনেক স্বামীর (বিশেষ করে সহোদর সহোদরার ক্ষেত্রে) এক স্ত্রী অতি প্রচলিত প্রথা ।[১১] এ বিষয়ে নানা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তিনি । আধুনিক ঔপন্যাসিক রাজেন্দ্রনাথ পুরীর 'এক আঁচল

মৈলী সী'তে দেখানো হয়েছে একটি মেয়ে হঠাৎ বিধবা হওয়াতে গ্রামের লোকেরা উদ্যোগী হয়ে জোর করেই তার সঙ্গে পুত্রসম দেবরের বিবাহ দিল, যাতে সংসারটা রক্ষা পায় ।

তাই আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিলে বোঝা যায় দ্রৌপদীর এই বিবাহ সেকালে সমাজসম্মত ছিল । যদি বলা হয় অন্য কোনো সাহিত্যে এর নিদর্শন নেই । তবে এও দেখা যায় মহাভারতের অন্য কোনো ঘটনা তা গীতার বাণীই হোক বা ভীষ্মের শরশয্যাই হোক তাও আর কোথাও নেই । মহাভারত প্রাচীন যুগের আয়নার মত । সে সময়টি বিধৃত করে রেখেছে । দ্রৌপদী সর্বাংশে পাণ্ডবকুলের পাটরাণী হবার উপযুক্ত । প্রতিটি পাণ্ডবই একাধিক বিবাহ করেছেন । কিন্তু তাঁরা কেউই দ্রৌপদীর মত নিত্যসহচরী ছিলেন না । সুখে দু:খে রাজসভায় অরণ্যে তিনি থেকেছেন । শুধু তাই নয় বিপদে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সঙ্কটকালে পরামর্শ দিয়েছেন এবং স্থির থেকেছেন সঙ্কল্পে । "দ্রৌপদী অবলা নন, জয়দ্রথ এবং কিচককে ধাক্কা দিয়ে ভুমিশায়ী করেছিলেন । অসহিষ্ণু, তেজস্বিনী, স্পষ্টবাদিনী, তীক্ষ্ণ বাক্যে নিষ্ক্রিয় পুরুষদের উত্তেজিত করতে পারেন । বনপর্ব ৫ম পরিচ্ছেদে, উদযোগ পর্ব ১০ম পরিচ্ছেদে এবং শান্তিপর্বে ২য় পরিচ্ছেদে দ্রৌপদীর খেদ ও ভৎর্সনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্বসাহিত্যে দুর্লভ ।"[১২] এ ছাড়া তিনি কৃষ্ণের মত ব্যক্তিত্বের প্রিয় সখী । এই চরিত্র নিয়ে বার বার নাটক লিখিত হবে এ কোনো নতুন কথা নয় ।

অমৃতলাল বসু 'যাজ্ঞসেনী'[১৩] নামে যে নাটকটি লিখলেন সেটি প্রথম অভিনয় হয় শনিবার ২২শে বৈশাখ ১৩৩৫ সালে । এ নাটকে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন দ্রৌপদীর যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্মের কথা । বস্তুত, তিনি দ্রৌপদী নামটি ব্যবহার করেন নি । কৃষ্ণা, পাঞ্চালী ইত্যাদি তাঁর অপর নামগুলি আছে । যজ্ঞসেন নামটি দ্রুপদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর কন্যা হিসাবে যাজ্ঞসেনী নাম । বিবাহ পূর্ব জীবনে তার ব্যবহার বাঙালি ধনী পরিবারের কন্যার মত । বাবা দাদার সঙ্গে ছদ্ম কলহ, সখীদের সঙ্গে খুনসুটি, অর্জুনের নাম শুনে লজ্জা পাওয়া ইত্যাদি ।

পরে, অর্জুন তাকে জয় করে নিয়ে এলেন ও পাঁচভাই ও কুন্তীসহ এক বাড়িতে থাকতে লাগলেন । এখানে কুন্তীর বিখ্যাত উক্তি 'যা পেয়েছ পাঁচভাইতে ভাগ করে নাও' এ কথা নেই, যদিও মূল মহাভারতে আছে । এ নাটকে নাট্যকার বলছেন, যুধিষ্ঠিরের মনে চিন্তা

এসেছে । 'হায়, সহোদর হয় পর, দারা এলে ঘরে,' ...... বঞ্চিত হবো কি আমি অর্জুনের প্রেমে ...... ' । এ সময় অর্জুন এসে যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করেন দ্রৌপদীকে বিবাহ করার জন্য জন্য, যেহেতু তিনি অগ্রজ । তাঁদের কথোপকথন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ ব্যাস এলেন ও পাঁচভাইকে 'দ্রুপদের দুহিতা'কে গ্রহণ করতে বললেন । 'অভিন্ন যে পঞ্চজন বঞ্চনার কথা নয় , প্রয়োগে প্রমাণ তার দেহ জগতের চক্ষে ।' শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কথা সমর্থন করলেন । তাঁরা সকলে কৃষ্ণের ভক্ত, ব্যাসেরও । তাই কিছু বাদানুবাদের পর তাঁরা সম্মত হলেন । কৃষ্ণারও অমত হল না । তাঁর মতে

'দুহিতার হিতাহিত পিতার সমান
কে জানে জগতে আর, লয়ে দেবকার্যভার
জন্ম আমার, শুনেছি মুখে ।'

এরপর প্রত্যেক ভাই পৃথক পৃথক সধবার চিহ্ন শাঁখা সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন । একেবারে শেষে অর্জুন এলে কৃষ্ণা তাঁকে বললেন, 'পঞ্চের গৃহিণী আমি / কিন্তু প্রেয়সী তোমার প্রিয় ।' ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে সুভদ্রাকে অর্জুন বিবাহ করে নিয়ে এলেন । তিনি সব থেকে বেশি সংখ্যায় বিবাহ করলেও আর কাউকে দ্রৌপদীর সামনে আনেন নি । দ্রৌপদী মনে মনে আহত হলেও যেহেতু এখন তিনি রাজ্ঞী, মহাদেবী তাই মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন না । এর পর যখন স্বয়ং কৃষ্ণ সুভদ্রাকে গোয়ালিনী বেশে সাজিয়ে আনলেন এবং কৃষ্ণাকে 'সখী' বলে সম্বোধন করলেন তিনি বিগলিত হয়ে গেলেন । বাঙালির মনের 'কানু প্রেম' এই অংশে অতি স্পষ্ট । বীর কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বাঙালির অনেক প্রিয় । অতএব তিনি ও সুভদ্রা দুইজনে দুইজনকে বোন বলে দুজনকে হৃদয় থেকে গ্রহণ করেন ।

পঞ্চম অঙ্কে দ্যুত খেলার প্রস্তুতিতে নাট্যকার রাজসভা না দেখিয়ে গুপ্তসংবাদ গ্রহণে আদিষ্টা চেটী-কতিপয়, প্রাচীর ছিদ্র-পথ ও গবাক্ষ থেকে রাজসভা দেখছেন ও নেপথ্য থেকে তাদের কণ্ঠস্বর থেকে খেলার ফলাফল কি হচ্ছে বুঝিয়েছেন । নতুন ধরনের মঞ্চসজ্জা নিশ্চয় । তৃতীয় দৃশ্যে দ্রৌপদীকে দু:শাসন আকর্ষণ করে আনেন ও তাঁর লাঞ্ছনা শুরু হয় । এখানে আমরা কৃষ্ণার ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতা প্রত্যক্ষ করি । তিনি অত্যন্ত কঠিনভাবে সকলকে ধিক্কার দেন । সেখানেই 'রাজ্ঞী যাজ্ঞসেনী' প্রতিজ্ঞা করেন, 'কাপুরুষ দু:শাসন-রক্তে সিক্ত না করিয়ে কেশরাশি কবরী বন্ধন করিব না কভু থাকিতে জীবন ।'

লজ্জাবাস হরণের সময় কৃষ্ণা একান্তমনে কৃষ্ণকে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু এ নাটকে গান্ধারী বিকর্ণসহ বস্ত্রাবরণাদি নিয়ে আসেন ও পুত্রদের তিরস্কার করে করে দ্রৌপদীকে নিজের আঁচলের আড়ালে নেন । তিনিও নারায়ণ ভক্ত । দ্রৌপদীকে অনুরোধ করেন শ্বশুরের বংশকে ক্ষমা করতে । উত্তরে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তব্য শুনে ভাবেন 'সদ্য অপমানে সে জ্বলছে ।' ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর আচরণে ও বক্তব্যে বাধ্য হয়ে বধূকে ডেকে বর চাইতে বলেন । কৃষ্ণা পতিদের দাসত্বমোচনের বর চেয়ে নেয় । ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যও ফিরিয়ে দেন । কিন্তু যাজ্ঞসেনী স্বগতে বলেন, 'কবে হবে প্রতিশোধ ।

নাট্যকার এ নাটকে শকুনিকে অন্যভাবে দেখিয়েছেন । তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কৌরবদের বিনাশ চাইতেন । নানা ভাবে ভুলপথে দুর্যোধনকে বিপথে চালিত করে তিনি তার ব্যক্তিগত ও বংশগত অপমানের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতেন । পান্ডবদের ক্রোধান্ধ করে না তুললে তারা মহাযুদ্ধে অগ্রসর হবে না । কৌরবদের দিয়ে পাপ কাজ করানো এই কারণে ।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও সামান্য একটু পরবর্তী সময়ের মধ্যে পৌরাণিক নাটক লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁদের অন্যতম । আলিবাবার মত লঘু রসাত্মক জনপ্রিয় নাটক তেমন লিখেছেন তেমনি গুরুগম্ভীর বাতাবরণে সুন্দর পৌরাণিক নাটকও লিখেছেন । তাঁর 'নরনারায়ণ'[14] অত্যন্ত মঞ্চসফল নাটক । এই নাটকের প্রযোজক ও শিক্ষক ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি । নাট্যমন্দিরে বুধবার ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৯৩৩ সালে প্রথম অভিনয় হয় । নাটকটি রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ মহাভারতের থেকেও রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিলেন । 'এক দৈবনিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর' মহাপুরুষের কাহিনী নিয়ে নাটক লেখার তাঁর বহুদিন থেকে ইচ্ছা ছিল । এইটিই তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক ।

নাটকটির নায়ক কর্ণ বলে তাঁর স্ত্রী রাধা কোথাও কোথাও বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন । কিন্তু দ্রৌপদী যেখানে থাকবেন তাঁকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে না । অবশ্য দ্রৌপদী নিজেও রাধাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । নাট্যকার দ্রৌপদীর মূল চরিত্রগুণ থেকে বিশেষ সরিয়ে আনেন নি । কখনও তিনি কৃষ্ণসখী । তাই অভিমান করে বলেছেন কৃষ্ণের বিশ্বরূপ কত লোকেই দেখেছে কিন্তু তাঁকে কৃপা করেন নি । কৃষ্ণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে দ্রৌপদী স্বয়ং ভীত

হয়েছেন,

'কখনও না কখনও বাসুদেব, এই
ক্ষুদ্র মর্মস্থল, কত কষ্টে ধরে আছি
ঐ দুটি চরণ কমল ।'

এখানে পৌরাণিক নাটকের চিরাচরিত ভক্তিমার্গের সুর এসে গেছে । অর্থাৎ সখীত্ব দাবী করলেও দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করেন ।

তাঁর পরিচিত চেহারা আমরা চিনতে পারি, যখন মহাযুদ্ধ হবার আগে শান্তি প্রস্তাবের কথা চিন্তাভাবনা করা হয়েছে । একমাত্র সহদেব ছাড়া ভীমঅর্জুন পর্যন্ত যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবে শান্তি স্থাপনে রাজী হয়েছিলেন । এতদিন এত কষ্ট ও অপমান সহ্যের পর দ্রৌপদী কিছুতে তাঁদের সমর্থন করতে পারেন নি । তিনি ঘোষণার মত বলেছেন,

'অগ্নিশিখা শিরে যদি
জন্ম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?
আমি যাব । ঘুমালি কি পঞ্চপুত্র মোর ?
ঘুমালি কি অভিমন্যু ?

ইদানিং কালে শুধু কাব্যে নয়, চিন্তাভাবনার মধ্যেও 'মহত্ব বোধ' প্রায় অবাস্তব বা ভান বলে মনে করা হয় । পরিবর্তে শরীরের দাবী, কর্তব্যের থেকে প্রেম বেশি স্থান পাচ্ছে । বর্তমান জীবনধারার এই দিকটা আমরা আধুনিক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংলাপকাব্য 'নন্দন কাননে দ্রৌপদী'তে দেখি । এখানে কর্ণ ও দ্রৌপদীকে দ্বিধাহীন প্রেমিক প্রেমিকারূপে অঙ্কিত করা হয়েছে । খুবই পার্শ্বচরিত্র দুর্যোধনের । এ কাব্যে যেহেতু তাঁরা পার্থিব জীবন ত্যাগ করে এসেছেন এবং স্বর্গে

'রমণীরা সবাই স্বাধীনা তারা স্বেচ্ছাপ্রণয়িণী
সম্পর্ক শৃঙ্খল নেই, অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেকের' ।

সামাজিক পরিচয়ের কথা জীবিত মানুষ যুধিষ্ঠির উচ্চারণ করাতে দেবদুতের দ্বারা সংশোধিত

হয়েছেন । অতএব কর্ণ ও দ্রৌপদী তাঁদের পৃথিবীর অবদমিত প্রেম প্রকাশ করেছেন । কর্ণ তবুও মানব জন্মের স্মৃতি মনে রেখেছেন, দ্রৌপদীর কাছে তা –

'তিক্ত-কটু-কষায়-কুৎসিত । স্মৃতিগুলি মুছে গেছে
স্মরণে রেখেছি শুধু মাধুর্য ও আনন্দের কথা ।'

স্বয়ম্বর সভায় নিজের 'কঠোর প্রত্যাখ্যান'কে দ্রৌপদী ব্যাখ্যা করেন 'যৎসামান্য কৌতুক' বলে । কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেন তার মুখে যে মনোভাব কাজ করেছিল তা হল –

'বীরশ্রেষ্ঠ
বাহুর দাপটে সকলকে প্রতিহত করে দেবে
সদর্পে হরণ করবে দয়িতাকে, আমি বীরভোগ্যা হব ।'

অন্যদিকে কর্ণ কৈফিয়ৎ দেন দ্যুতসভায় দ্রৌপদীকে 'বিস্ময় কুকথা' ছিল এক ব্যর্থ প্রণয়ীর আর্তনাদ' এবং সেই মুহূর্তে দ্রৌপদী আশা করছিলেন তাঁর প্রথম প্রণয়ী কর্ণকে পাশে পাশে । অবশেষে সখা কর্ণকে নিয়ে মন্দাকিনীর জলে 'খেলার কৌতুকে, নির্মল হাসিতে' দশদিক ভরিয়ে দিলেন । তিনি 'অগ্নিসম্ভূতা' বলে কামনা বাসনাময়ীনারী ছিলেন এই হল নাট্যকারের বক্তব্য । কিন্তু এই অগ্নি পূত যজ্ঞঅগ্নি, সে কথা তিনি উল্লেখ করেন নি ।

এই দশকের একটি অতীব মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় নাটক শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ'[১৫] । এখানে নাট্যকার মঞ্চায়নও নূতন ভাবে করেছেন । একজন কথক বা 'কথক ঠাকুরানী' আছেন, তিনি সব কটি চরিত্রে অভিনয় করেন এবং মন্তব্যযোগে কাহিনীটি বলেন । আমাদের দেশে যে প্রচলিত কথকতা গ্রামে গঞ্জে, তীর্থস্থানে হয় তারই মত । তবে নাগরিকতার সুযোগ মঞ্চসজ্জায় ও আলোকসম্পাতে এ ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে । বৈচিত্রহীনতা কাটাতে জুড়ির দল আছে । প্রাচীন লোকশিল্প পাঁচালী গানের থেকে এই রূপ এসেছে । যেমন, সেখানে মূল গায়েন থাকেন একজন । তিনি কখনও একটু নেচে দেন, কখনও চামর দোলান, কখনও একটু অঙ্গভঙ্গী করেন । সঙ্গে থাকে 'দোহারকি'র দল । নাট্যকারের জবাবদিহিতে তিনি এর আগে কোনোদিন নাটক গল্প বা গান লেখেন নি । 'কিন্তু এ লেখাটি লিখতে বসে, আমার কলমে গান এল ।' পরে তিনি তিজনবাঈ, রাজারাম ভউ কদম, পুনারাম এই সব গুণী লোকশিল্পীর

সাক্ষাৎ পেয়ে দেখেন তাঁদের একটি করে জুড়ির দল থাকে । এ তথ্য তাঁর জানা ছিল না । 'কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যের শিকড় কি এইভাবেই কাজ করে আমাদের মধ্যে ?' এই ভাবে লোকায়ত ভাষা শিল্প গঠন প্রকরণের সঙ্গে একটি মিথ ভাবনা মিশিয়ে শ্রীমতী মিত্র গঠন করেছেন 'একটি নারীর দু:খ ভোগের স্তরে স্তরে ...... সমাজের অন্ত:সারশূন্যতা ।

আলোচ্য নাটকটি শাঁওলী মিত্র দ্রৌপদীর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি নির্বাচন করেছেন আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিতে । তার মধ্যে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এ কথা অনস্বীকার্য আজও মেয়েরা খুব কম সংসারেই পুরুষের সম-মর্যাদা পান । বিবাহের সময় পাত্রীর মতামতের মূল্য প্রায়শই অধিকাংশ পরিবারেই নেওয়া হয় না । গ্রামে অথবা শহরের অশিক্ষিত রক্ষণশীল পরিবারে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক । তবে মহাভারতের সময়টাও মনে করতে হবে । তখন বহুপতি গ্রহণ করার সামাজিক একটা নিয়ম ছিল । আজকের যুগে কোন মেয়ের সঙ্গে একাধিক পুরুষের নিশ্চয় বিবাহ দেওয়া হয় না । এবং সমাজ অনুযায়ী অনেক সময় মানসিকতাও প্রস্তুত থাকে ।

মহাভারত কাব্য হলেও নাটকীয় । তাই এর ক্লাইম্যাক্স বিন্দু কল্পনা করা যায় দ্যুত পণে হেরে যাবার পর দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় লাঞ্ছিত করার সময়টিকে । আজও কিন্তু এই ঘটনাই ঘটছে । বরং আমাদের দেশে যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মহিলাদের প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করা বাড়ছে । আদিবাসীরা চিরকাল এই নির্মমতার শিকার ছিলেন । আজ রাজধানীতে লোকে বিনা প্রতিবাদে এ সব মেনে নিচ্ছে । বড় মফ:স্বল শহর চন্দননগরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আর মহাভারতের যুগের মত সবাই উপভোগ করেছে । মেয়েরা শারীরিক ভাবে দুর্বলতর বলে এই চূড়ান্ত অপমান । এ অপমান শুধু শারীরিক নয় মানসিকও । এ যুগে কেউ গান্ধারীর মত ক্ষমতাশীল নন বলে এগিয়ে আসার দু:সাহসও করেন না ।

কিন্তু এখনকার দিনেও বহু মেয়েকে চোখের জলে নীরবে নিজের ভাগ্য মেনে নিতে হয় । দ্রৌপদী তা করেন নি । তিনি বুদ্ধিমতী এবং গুণবতী ছিলেন বলে পঞ্চস্বামীকে অনায়াসে পরিচালনা করতেন । যুধিষ্ঠিরকে ধিক্‌কার দেবার সাহস তাঁরই ছিল । নিজের অধিকারে তিনি অরণ্যে বা রাজসভায় পাণ্ডবদের প্রাধানা মহিষী থাকার গৌরব অর্জন করেছিলেন । তিনি তাঁদের

মহাপ্রস্থানের পথেরও সঙ্গী। যদিও নাট্যকারের মতে চিরকাল একসঙ্গে থাকার অভ্যাসে তিনি তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার কথাও মনে রাখতে হবে। আজকের যুগে অল্পসংখ্যক হলেও কিছু নারী ক্ষমতার চূড়ান্তে উঠেছেন। ইন্দিরা গান্ধী কেবল নারী বলে নয়, সবথেকে দাপটের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন বলেও পরবর্তী কাল তাঁকে মনে রাখবে। ইসরাইল, শ্রীলংকার মত তৃতীয় বিশ্বেও আমরা এর সহধর্মা পেয়েছি, ইংল্যান্ডে তো বটেই। দ্রৌপদীও সাধারণ মেয়েদের মত নিজেকে অসহায় মনে করেছেন, মহাভারতে তা দেখা যায় নি। যে স্বামীকে যে কাজে প্রয়োজন হয় অবস্থা বুঝে তাঁর কাছে গেছেন ও কার্যোদ্ধার করিয়েছেন। তবে তাঁরও মানবিক দুর্বলতা ছিল। তিনি ভালোবেসেছিলেন শুধু অর্জুনকেই এবং এই 'শাপে' তাঁর 'সগ্গে' যাওয়া হল না।

সূত্র নির্দেশ

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য — মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২। অশ্রুকুমার সিকদার — 'বারে বারে চম্পকনগর', প্রবন্ধ, দেশ পত্রিকা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
৩। মন্মথ রায় — চাঁদসদাগর নাটক', ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪ খণ্ড, কালান্তর গ্রন্থ, 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধ।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধ, কালান্তর গ্রন্থ
৬। শম্ভু মিত্র — চাঁদ বণিকের পালা, এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ
৭। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় — অজিতেশ নাট্যসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, সম্পাদনায় সুনীল দত্ত, ও সন্ধা দে। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রকাশক সীমা দত্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৮
৮। রাজশেখর বসু — মহাভারতের অনুবাদ, চৈত্ররথ পর্বাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭১-৭২
৯। রাজশেখর বসু — মহাভারতের অনুবাদ, আদিপর্ব পৃষ্ঠা ৮৭

১০। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল – নীতি যুক্তি ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ । আনন্দ পাবলিশার্স

১১। D.N. Majumder - Races and Culture of India. Asia Publishing House, Calcutta 1965.

১২। ক্ষীরোদপ্রসাদ চৌধুরীর চিঠি মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে ১৭·১০·২৪ তারিখ

১৩। অমৃতলাল বসু – যাজ্ঞসেনী, বসু পরিবার কর্তৃক মুদ্রিত

১৪। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ – নরনারায়ণ সম্পাদনা ড: ভবানী গোপাল সান্যাল, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি: দ্বি সং: জুলাই ১৯৬২

১৫। শাঁওলী মিত্র – নাথবতী অনাথবৎ, ভূমিকা, ঐ পিছনের মলাট, এম·সি· সরকার এণ্ড সন্স প্রা: লি: